শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের পত্রিকা

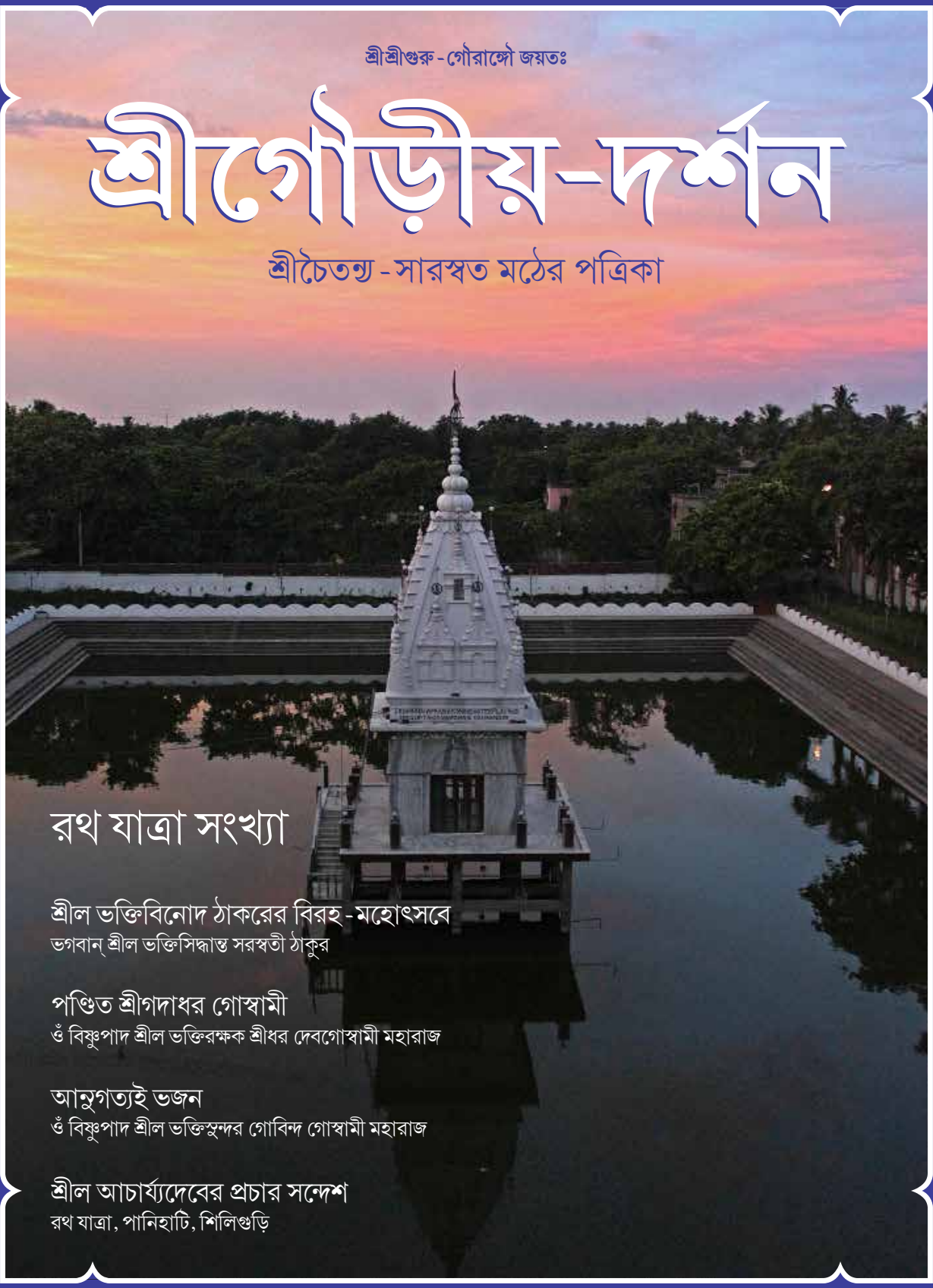

রথ যাত্রা সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবে
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

আনুগত্যই ভজন
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার সন্দেশ
রথ যাত্রা, পানিহাটি, শিলিগুড়ি

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ঈশ্বর বিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্বপ্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতি আশ্রয় করুন। মধ্যমাধিকারী মহাত্মাগণ সংশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন। সমস্ত জগৎ হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

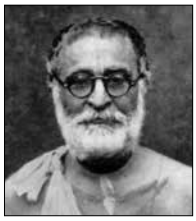
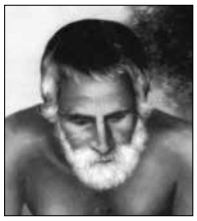

সূচীপত্র

প্রীতি ২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকরের বিরহ-মহোৎসবে ৬
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী ১২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

আনুগত্যই ভজন ১৫
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ

রথ যাত্রা ১৬

পানিহাটি মহোৎসব ১৯

শিলিগুড়ি উৎসব ২১

শ্রীচন্দন যাত্রা ২৪

হুগলীতে প্রচার ২৮

বিরহ মহোৎসব ২৯

চাতুর্ম্মাস্য ৩২

প্রীতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রীতি, এইশব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবা মাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটী তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। তাহা নহে, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয় সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি ? যাহা নিজের প্রিয় তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানবজীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

পরমার্থ তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভুত, তাঁহারা ইহকালে ধন-ধান্য, রাজ্য-সম্পদ, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত তাঁহাদের সেই সেই ভোগ বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতিলাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতিলাভে আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ; —

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতিদিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥
বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল "রী" ॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়নীয়িল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব সে কি ?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এতিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতিকুল তার ॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

পদার্থ দুই প্রকার, চিৎ ও অচিৎ। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহা কিয়ৎস্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূল বস্তুরূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে। চিৎপদার্থে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিতরূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎস্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, আকর্ষণ ও গতিও তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক প্রীতির স্বরূপ কি ?

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভু চৈতন্য এবং জীবাত্মা অণু চৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভু চৈতন্য এবং অণু চৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড় তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণে জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে থাকে ! স্বতন্ত্র গতিশক্তিদ্বারা পৃথক হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধজীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতিধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে অথচ প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতা বশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়। জড়জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে এক বস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন; —

ব্রূয়াৎ যাবান্বা অয়মাকাশ স্তাবানেষোন্তর্হৃদয়।
আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব
সমাহিতে। উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসা
বুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ
নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি॥

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছ। সেই সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত, বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়— পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড়জগতে ঐ সমস্ত হেয় পরিপূর্ণ অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক।

এখন দেখুন চিজ্জগতের মূল ধর্ম্ম-প্রীতি অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন; —

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে॥"
"পিরীরি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥"

চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলাপরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ ধর্ম্মে টানিতেছেন ! জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থ। সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন ? যদি তাহা করেন তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয় ?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্। বদ্ধজীব দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ তাঁহাদের প্রীতিধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা

একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড় সুখসমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমাননদ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া—এইরূপ প্রলাপ বাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্মজগতের সুখ হইতে হইতে বঞ্চিত হন। বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্ম-বিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা; —

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
সে দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখহারা॥

তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥

কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্ত্রী নয়।
কুলবতী হঞা; পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥

যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
থাক ঘরে কুল লই॥

গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিলক তুলসী দিয়া॥

পরশী দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

জীব এ জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া, নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞানপ্রযুক্ত আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধরণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোক-নিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যাসম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের অরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন; —

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গ-রসায়নম্॥

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধি-বদ্ধজীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ,

শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণীশক্তি-স্মরণ, বংশীনাদ শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতীয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

চিজ্জগৎরূপব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রন্তরূপে উদয় হইয়াছে সেই চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি তাহা জড়-বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা

মানস-ভাব-গত প্রীতি শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতি মাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে আনুরক্তি তাহাই শুদ্ধপ্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে; —

ন বা অরোপত্যুঃ কামায়পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যুপক্রম্য নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মানস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ংভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরেদর্শনেনশ্রবণেনমত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড়জগতে ও লিঙ্গজগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে মৈত্রয়ী, স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতিকামনায় পতি প্রিয় হন না কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড়জগতে ও লিঙ্গশরীরে বিরাগপ্রাপ্ত জীব পরম প্রিয় বস্তু যে আত্মা তাঁহাকে দর্শন মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়, অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মা প্রতি যে প্রেম তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। বিশ্ব প্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে যে প্রেম কেবল আত্ম প্রেমের বিকারমাত্র। আত্মাও আত্মাতে যে প্রেম তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন এই যে,—

কৃষ্ণমেবমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্।

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহা গুণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণপ্রতি যে প্রেম তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল স্বজন করিয়াছেন। ভাই সকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবে

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর বক্তৃতার চুম্বক
(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫ষ্ঠ খণ্ড ৪৮ সংখ্য)

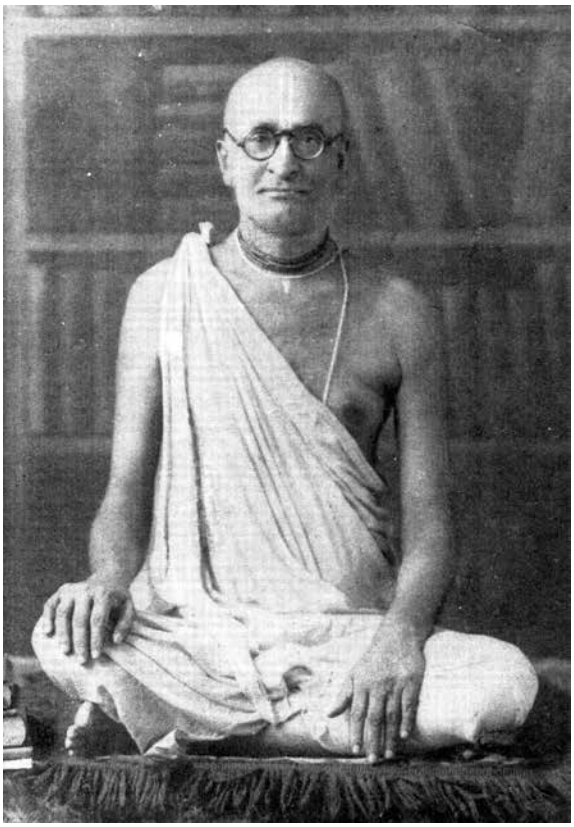

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

আমি বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি;—একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার। তদ্ব্যতীত আমার আর কোনও কার্য্য নাই। 'ম'-কারের অর্থ—অহঙ্কার; সেই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ি ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পুরণ করেন। তবে প্রাকৃত-জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ী জাগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণবঠাকুর অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে। সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত-জগতে সমুদ্রের শুখাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার অপূর্ণ হয় না। সে ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে ক্ষতি হয় না। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" এমন বৈষ্ণব ঠাকুরকে আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। ইহজগতে আমার পবিত্রতাকারক আর কেহই নাই। এখানে একজনের সহিত অপরের দেখা হইলে ঈষা-মূলে অহঙ্কার আসে। একজন অপরকে নিজ অপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র মূর্খ, কুৎসিত ইত্যাদি ভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণব-ঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত; কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত। চক্ষু আমার পরম শত্রু, সে সর্ব্বক্ষণ রূপজ-মোহে প্রমত্ত; কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত; রসনা সুস্বাদু দ্রব্যসংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধ-গ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয়-চিন্তায় মত্ত। আমি কেবলমাত্র ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আছি। আমার অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি উর্দ্ধে ছিলাম্ অধঃপতিত হইয়াছি। নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি। এহেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্ত্তব্য নেই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই। যাবতীয় অহঙ্কার,—অর্থাৎ দর্শনকারী স্পর্শকারী, গ্রহণকারী ও চিন্তনকারি-সূত্রে যাবতীয় অভিমান—যে অভিমান ইন্দ্রিয়জবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নহে—যে-বৃত্তি দ্বারা আমি পতিত ও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, সেই অভিমান ছাড়িয়া আমি আজ বৈষ্ণবের শরণাগত। আমি আজ যে-স্থানে উপস্থিত, সেখানকার প্রত্যেক বস্তুই আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে। আমার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া যখন দেখিতেছি যে, আমার ন্যায় নারকী আর কেহই নাই, তখনই বুঝিতেছি যে, বৈষ্ণবপাদপদ্মাশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

"বৈষ্ণব" শব্দটী শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বিষ্ণুর উপাসক একটী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জীববিশেষ। কিন্তু তাহা নহে। ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জানেন যে, ভগবান সকল জগতে ব্যাপ্ত,—অন্তর্য্যামিসূত্রে সর্ব্বত্র অবস্থিত। একদিকে তিনি—ভূমা, ব্যাপক আবার অন্যদিকে প্রত্যেক ত্রাসরেণুর ভিতর নিজ অসীম বৈকুণ্ঠরাজ্য ধারণ করিতে সমর্থ। মানুষের বুদ্ধিতে 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ যে বস্তু জ্ঞাপন করে, 'বিষ্ণু' শব্দে তাহা বুঝায় না। 'বিষ্ণু' শব্দ—বিভুত্ব বা ব্যাপক ধর্ম্মসূচক, সাম্প্রদায়িক শব্দ নহে। বৈষ্ণবই সেই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব—ভগবানের অভিন্ন কলেবর। এই 'বৈষ্ণব'-শব্দে বিষ্ণুসম্বন্ধি অর্থাৎ বিষ্ণুর (paraphernalia) বস্তুকে বুঝায়। তিনি আত্ম-ধর্ম্মবিৎ, জড়জগতের সীমাবিশিষ্ট ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন। মানবের সঙ্কীর্ণ বিচার অতিক্রমকরিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব'। 'বৈষ্ণব'-শব্দে অবৈষ্ণবতা বাদ দিয়া সঙ্কীর্ণতা আরোপ করা যায়, —এরূপ নহে। আমরা এইরূপ বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার করি।

আজ একটা কার্য্যোপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ কোন বৈষ্ণব-সম্রাটের অপ্রকট-তিথি। সাধারণ-মানুষের মৃত্যুতে শোক-সভাদির অধিবেশন হয়, কিন্তু আজ আমাদের মহা-আনন্দের দিন। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু-দিনই সেই জীবের শেষ বিচারের দিন—জীবিতাবস্থায় সে যে-সকল সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের শেষ-বিচারের দিন। মানবের হিসাব-নিকাশের শেষ দিনই মৃত্যু-দিবস। সেইদিন জীবের দণ্ড বা পুরস্কারের কাল উপস্থিত হয়। বৈষ্ণবের বিচার এরূপ নহে। তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। সাধারণ জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্ম করে, সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের ভাল বা মন্দ ফল লাভ করে। মৃত্যু সেই ভাল-মন্দের প্রাপ্তির দিন। পাশ্চাত্যদেশে ঐ দিনকে 'Day of Judgement' বলে। যাঁহারা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর দিন—জীবিতাবস্থার ক্রিয়ার শেষ ও তৎফলাফল-প্রাপ্তির প্রারম্ভ। এক-জন্মেই জীবে শেষ, দ্বিতীয় জন্ম নাই, এরূপ বিচার ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতেতর-দেশে এইরূপ কথা স্পষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, আর যাঁহারা স্বীকার করেন না,—এই দুই মতের সম্বন্ধে আমি আজ কিছু আলোচনা করিব।

জন্মান্তরবাদ-অস্বীকারকারী বলেন যে, যদি আমরা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করি, তবে আমরা বলিতে পারি যে, এই জন্মের ফল যখন পর-পর-জন্মে ভোগ করিতে হয়, তখন এই জন্মে আমি কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লই—ভোগ করিয়া লই; পরজন্মে make up (পূরণ) করিয়া লইব। এই ভাব গ্রহণ করিলে জীব ধর্ম্মপথে চলিবে না, অধর্ম্মপথে চলিবে। অতএব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা উচিত নহে।

যাঁহারা তথা-কথিত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাও প্রশংসনীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, এ জীবনে পুণ্যকার্য্যাদির দ্বারা জীবিতাবস্থায় সুখ ও পরবর্ত্তিকালে স্বর্গাদি রাজ্য-ভোগ-লাভ হয়। এই জন্মে অধর্ম্মপথে চলিলে ইহ-জন্মেও সুঃখ, পরজন্মেও দুঃখ! এই বিচারে কর্ম্মস্রোতে ভাসমান জীবের উদ্ধারের পথ চিরতরে রুদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত এই সকল চিন্তাস্রতো বাধা দিয়া বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

প্রত্যক্ষবাদী বলেন যে যখন এই জন্ম পাইয়াছি, তখন বেশী করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়া লওয়া যাক্। 'Make hay while the sun shines'—সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে থাকিতে কাঁচা ঘাস শুখাইয়া লও। ভারতে শাক্যসিংহ, সাংখ্যাকার, মীমাংসকাদি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য-জীবন-প্রাপ্তি একটা chance মাত্র,—এই বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্য পবিত্র থাকিবে। এই যুক্তি সাধারণ-জ্ঞানে কার্য্যকরী হইলেও ভাগবত তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্ল্লভ। 'মানুষ্যম্'—মনুষ্য-সম্বন্ধি জন্ম, পশু-পক্ষী-কীট জন্ম নহে। আবার এমন কোন স্থিরতা নাই যে, পরজন্মেও 'মানুষ' হইব,—ভূত, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মের যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা অন্য কার্য্যে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।

'অর্থদম্'—'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন, তাহা দানকারী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, জীবন—অনিত্য। শীঘ্র শীঘ্র 'অর্থ' অর্থাৎ 'পরমার্থ' অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমানের অন্তর্গত হইবেন না। কেননা, ঐরূপ বিচারকারীর নিকট মনুষ্যজন্মের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধ হইল না। 'অহং'-'মম'-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হন না। নিত্যকৃষ্ণ-বৈমুখ্য বশতঃ অসুবিধায় পতিত ব্যক্তির অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবে—সত্য বস্তুতে শরণাগতি ব্যতীত অন্যগতি নাই। হাতী নিজেকে 'হাতী', কুকুর নিজেকে 'কুকুর' বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু মানুষ সেরূপ করিবেন না,—নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়র্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি প্রাকৃত-বুদ্ধিতে বর্ণাভিমানে 'ব্রাহ্মণ' নই, 'ক্ষত্রিয় রাজা' নই, 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' নই, আশ্রমাভিমানে 'ব্রহ্মচারী' নই, 'গৃহস্থ' নই, 'বানপ্রস্থ' নই, 'সন্ন্যাসী'ও নই। কিন্তু প্রোন্মীলিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই। যে-দিন সূত-গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সূত গোস্বামী—বর্ণসঙ্কর-কুলে জাত। ঋষিগণ কিন্তু এই বুদ্ধি ছাড়িয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের অভিমান, বয়োবৃদ্ধির অভিমান, অপরের সহিত তুলনায় আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করায় বটে, কিন্তু এতাদৃশ অভিমান-মত্ত ব্যক্তিগণের কোনও সুবিধা নাই। এইরূপ ভেদ কখন গত হয় তদ্বিষয়ক বিচারে গীতা বলেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'পণ্ডিতো বদ্ধ মাক্ষবিৎ।' 'পণ্ডা'—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিদ্বারা জীব 'পণ্ডিত'-শব্দের যে বিচার করেন, বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিজাত বিচার তাহা নহে।

আমরা এই জগতে পরস্পরের সহিত পরস্পর বিবাদে প্রমত্ত। আবার বিশেষত্ব এই যে, বিবাদে পরাস্ত হইলেও আমরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়ি না,—যে 'অহঙ্কার' আমাদিগকের নরক-পথে লইয়া যায়।

'সম্ভব'—জন্ম। এই মনুষ্য-জন্ম মহা-দুস্প্রাপ্য, অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জগতে অনন্তকোটি জীবের তুলনায় মানুষ সংখ্যায় খুব অল্প। উদাহরণ-স্থলেও দেখা যায় যে, একটি অল্প-পরিসর-যুক্ত স্থানে অসংখ্য কীটের সমাবেশ রহিয়াছে। এমন মনুষ্য-জন্মে অনিত্যতার উপলব্ধি না হইলে মানুষ নিশ্চয়ই মূর্খ' গর্দ্দভেন্দ্র-শেখর।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

বোতলের ভিতর সুরক্ষিত মধু পাইবার লোভে কাঁচের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় পিতা-মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনিত্য দেহে 'অহং'-অভিমানে অভিমানী ব্যক্তির সহস্র সহস্র চেষ্টায় ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার যোগ্যতা নাই। এজগতে জীব অজ্ঞরুঢ়িবৃত্তির দ্বারা চালিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজের প্রত্যক্ষ বিচারের সাহায্যে নিজের সুবিধা করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, ত্রাসরেণুর ভিতর, শব্দের ভিতর, ধাতুর ভিতর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতর ভগবান্ বিশ্বম্ভর চৈতন্যবস্তু অবিস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া অচণ্ডালকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের চঞ্চলতা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের ভোগের বাসনা, বড় হওয়ার আশা, 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁহার কথা শুনিবেন। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর প্রার্থীর কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না। কিন্তু তাঁহাদেরও জানা উচিত, মৃত্যু যে, অবশ্যম্ভাবী—'অদ্যবাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥'

আমরা চৈতন্য-বস্তু। কিন্তু আমরা যখন চেতন হইয়া বৈষ্ণবের নিকট—পরমহংসগণের নিকট উপনীত হইলাম না,—তাঁহাদের কথায় কর্ণ দিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ summarily reject করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে, 'আত্মীয়'-নামধারী, সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই,—সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন্। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ সামর্থের দ্বারাও সকলেই ভগবানের সেবা করুক। 'তূর্ণং যতেত'—কাল-বিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ব বিধ মঙ্গল—বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণবই জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরি-পরায়ণগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য পাদপদ্ম দর্শনের যাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জন্ম নাই। এমন বৈষ্ণবের বিরহ-তিথিতে তাঁহার কথা স্মৃতিপথে আনিবার জন্যই এই মহোৎসব। এস্থলে লোকে বলিতে পারে,—'বিরহ বাসরে অনন্দোৎসব কি প্রকারে হয়? এ জগতে সে দিনে ত' শোক-সভারই অধিবেশন হয়?' তাহার উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের 'মৃত্যু' নাই। তিনি—অমর, তিনি—ভগবানের সঙ্গে নিত্যলীলায় নিযুক্ত তাঁহার কার্য্য—কেবলমাত্র কৃষ্ণ-সেবা। তাঁহার প্রকট-লীলায় কার্য্যও—কৃষ্ণসেবা এবং জীবিতোত্তর কালেও তাঁহার কার্য্য—নিরবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণসেবা। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—নিত্য।

আপনারা বিচারের কথা-শ্রবণে কষ্ট বোধ করিতেছেন বটে; আপাততঃ শারীরিক কষ্ট হইলেও হরিকথায় আপনাদের নিত্য উপকার হইবে। বর্ত্তমানে এই কথা আপনাদের প্রয়োজনীয় না হইলেও মঙ্গলপ্রার্থী হইয়াই আমি এই কথা বলিতেছি।

এই বৈষ্ণব কি করেন? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, সুতরাং তাঁহার ভজন কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু যে কৃষ্ণ, তিনি তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট নিজেকে অসমোর্দ্ধ বলিয়া জানাইয়াছিলেন। তিনি ত্রিসত্য করিয়াছেন যে, তিনিই 'ভগবান্'—

১। **দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।**
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

২। **যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।**
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥

৩। **সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সহস্র-সহস্রবার ইহা বলা সত্ত্বেও জীবের জ্ঞানোদয় হইল না। আপনাকে ভজন করিবার উপদেশ আপনিই দিতেছেন, এইরূপ স্বার্থপর বাক্যে অনেকে কৃষ্ণভজন বুঝিল না। সেইজন্য পরম-করুণাময় ভগবান্, ভক্তরূপে, ভজনকারিরূপে এই জগতে আসিলেন, যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গালগল্প স্বষ্ট হইয়াছিল যে,—
"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"

মূর্খ-সম্প্রদায়, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করে, করুক্। যদি তাঁহাকে কেহ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে স্বীকার করেন, 'শচী-পিসীর' ছেলে বলেন এবং এই বিচারেও তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহার দাসগণের নিকট পৌঁছেন, তবে তিনি লোকের নাড়ী-নক্ষত্র নাড়া দিবেন, তাঁহার মৃত্যু হইবে—অর্থাৎ একাল পর্য্যন্ত তাঁহার মূর্খতা-সম্ভূত সংগৃহীত জ্ঞান স্তব্ধ হইবে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত মূর্খতাও অভিজ্ঞতাকে মল-মূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া পরম-সত্যের অনুসন্ধান করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই "শ্রীচৈতন্যদেব" হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিলেন যে, কৃষ্ণের জন্য যাঁহার এত স্বার্থ, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।

আর একদল ভাবিলেন, মহাপ্রভু কৃষ্ণ নহেন, —ভক্ত। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব বা গুরুর নিকট পড়িতে হয়। 'গুরু' কিন্তু যে-সে ব্যক্তি নহেন। ভগবানের চব্বিশ-ঘণ্টা উপাসক ছাড়া কেহই 'গুরু' নহেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে যদি কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে কৃষ্ণের চরিত্র অলোচনা করেন, তবে মায়া হইতে উদ্ধার পাইবেন। চৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না—চৈতন্য হয় না।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্যকার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চশ্‌মায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দে খিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আ সিলেন, তখন জগন্নাথকে 'মুরলীবদন কৃষ্ণ' দেখিলেন। আমরা আমাদের চোখে 'পুঁয়ের মাচা' দেখি। জড়লোক 'জগ ন্নাথ' না দেখিয়া ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় বা চেতন-রহিত কাষ্ঠ দেখে, আবার কেহ বা জীবিকা-বিশেষ দর্শন করে। 'গৌড়ীয়' পত্রে কোন বৈষ্ণবের জগন্নাথ-দর্শণের কথা আমি পাঠ করিয়া আপনাদিকে শুনাইতেছি—গৌড়ীয়—৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৩।৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের পরিচয় দিতে। শ্রীজগন্নাথের সেবকসূত্রে আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। বিষয়টা এই,—

প্রথমভাবে ভগবদ্দর্শনকে বেদশাস্ত্র 'সম্বন্ধ' বলেন। যিনি দর্শন করেন, তিনি—দর্শক, যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি—দৃশ্য, যে-বৃত্তি অবলম্বনে দর্শক ও দৃশ্য সম্মেলন হয়, তাহা—দর্শন। যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন ভিতর অনিত্যতা আছে, তাহাই স্মার্ত্তাচার। বৈষ্ণব বিচার ঐরূপ নহে; সেখানে ঐ তিনটাই নিত্য। সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে প্রাপ্যবস্তুলাভে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের জন্য যদি শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ না করি, ভজনের অছিলায় বাহ্য

বেষ ধারণ করি, অসংখ্য হরিনামোচ্চরণের ছল করি, তবে কেবলমাত্র পিত্তবৃদ্ধি হইবে—নামাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপারাধ ও নামের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে ক্ষীরের বদলে পঙ্ক গ্রহণ করেন। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন ভজন করি, কি ভজন করি, ও সমস্ত জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ; দীক্ষা-কার্য্যটাই—সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদান-লীলা।

জগন্নাথের প্রথম দর্শন—নিরাকারবাদী দেখেন,—জগন্নাথদেব কাষ্ঠ-মাত্র। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ছেলেভুলানো-ভাবে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। কেননা, তবে জগন্নাথদেবের পাদপদ্ম হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত দর্শন হইত।

লৌকিক-দৃষ্টিতে প্রথমে পাদপদ্ম-দর্শন হয়। নিম্বকাষ্ঠের পদ-দর্শন হইলে পৌত্তলিকতা হইত। জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নহে। আকার-দর্শনে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইয়া কোথায় তাঁহার পাদপদ্ম অবস্থিত, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধায় হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পদদ্বয়ের দর্শন দিতেছেন না। তাঁহার পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হইলে অন্যবস্তু-দর্শনে বিরক্তি আসিবে; এই জন্যই তিনি পদদ্বয় দেখাইতেছেন না। বদ্ধজীবকে তাহার যোগ্যতানুসারে নব্য-ব্রাহ্মবাদের দ্বারা আক্রান্ত করাইবার জন্য তিনি পদযুগল দেখান না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁহাকে মুরলীবদন ও তাঁহার পদনখ-শোভা দর্শন করেন। আমার ন্যায় ব্যক্তি, দূরবর্ত্তী মণিকোঠার ভিতরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে যাইয়া বৃদ্ধার 'পুঁই মাচার দর্শনের' ন্যায় দেখে। গৌরসুন্দর কিন্তু সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখিলেন—প্রণব-পুটিত মূর্ত্তি দেখিলেন না। জগতের ব্যাপারের অন্যতম শ্রীজগন্নাথকে দেখিলে খণ্ডিত দর্শন হইবে—অন্য কিছু দেখিবে।

শ্রীজগন্নাথদেব মানবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্ত-বিগ্রহ—অর্চ্চা-বিগ্রহ আসিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় নহেন। যাহারা তাঁহাকে কাঠ দেখিবে, তাহারা সংসার কূপে-জলহীন মীনের ন্যায় থাকিবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত জগন্নাথকে দেখা উচিত। আমি নরাধম, তিনি সর্ব্বজগতের পতি,—সমগ্র দেবলোকের পতি—তিনি দেবদেব। তাঁহার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কৃত্য নাই। বিশিষ্ট-জ্ঞানময়—বিজ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা সেবা-বুদ্ধিতে তাঁহাকে দর্শন করা উচিত, কেন না,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তুর নিকট ইহজগতের কোন বস্তুই উপস্থিত হইতে পারে না। অচিৎ-এর বৃত্তিযুক্ত চক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শন হয় না। এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্যজগতের দৃশ্যবস্তু বশ্য-বস্তু দর্শন হয়। সেই দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। এ দেশে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়া আমরা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ভ্রমণ করিতে করিতে সময় কাটাইতেছি।

জগন্নাথের দ্বিতীয় দর্শন—দর্শন-জন্য সেবায় অধিকার। অভিধেয়ের বা দ্বিতীয় দর্শন-বিচারে পূর্ব্বাচার্য্যগণ চৈতন্যবৃত্তিতে সেব্যবস্তুর সেবা করেন। এই দর্শন শিখাইবার জন্য অভিধেয় ভক্তিতে অর্চ্চন বা উপাস্যবস্তুর সেবা শ্রীভাষ্য ও অনুভাষ্যাদির আলোচনাকারী মহামহা-বৈদান্তিকই ভগবদর্চ্চনের অধিকারী। অতএব জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিবেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজনের নামে 'অনুকরণ' করে,—মহাজনের অনুসরণ করিতে পারে না; কেননা, মূলে তাহাদের গুর্ব্বানুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানেরই অভাব।

জগন্নাথের তৃতীয় দর্শন—প্রয়োজন তৃতীয় দর্শন। লোকের ভিড় ঠেলিয়া জগন্নাথ দর্শন করা অপেক্ষা চক্রদর্শনে ভগবদ্দর্শন করা ভাল। তাহাতে সার্ব্বকালীন সেবা করিবার সুযোগ। নিকটে যাইয়া সেব্যের অর্চ্চনে কনিষ্ঠাধিকার। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভজনে—মধ্যমাধিকার, আর সেবোন্মুখী হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিয়া ভজনে—উত্তমাধিকার বা মহা-ভাগবতাধিকার।

পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ

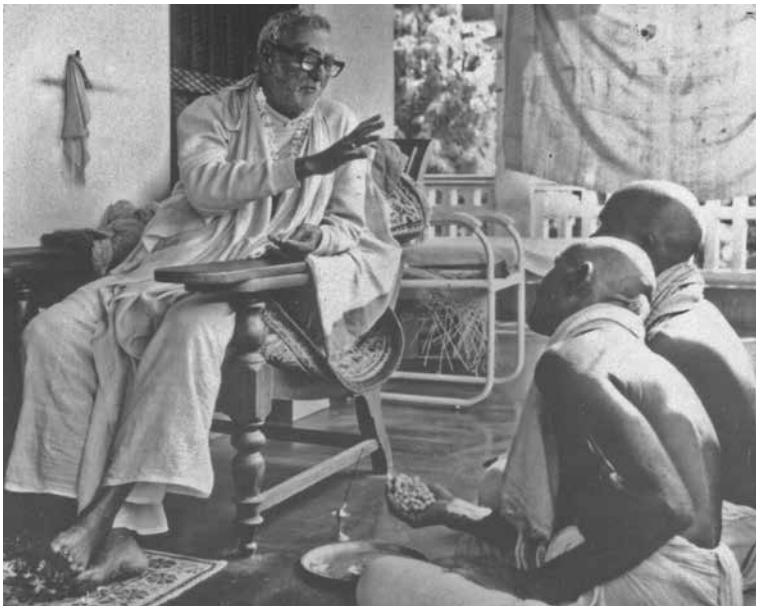

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীগদাধর গোস্বামী সর্ব্বোত্তম। মধুর কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধিকার স্থান যেরূপ অবিসংবাদিতরূপে তুলনামূলে সর্ব্বোত্তম, সেইরূপ উদার-কৃষ্ণ গৌর-লীলায় উদারমধুররসসেবায় তুলনামূলে শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর চরিত্রে ঔদার্য্যময় মধুররসবিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাধিক আকর্ষণের বিষয়। মহাজনগণ পণ্ডিত গদাধরে শ্রীরাধাতত্ত্ব সন্দর্শন করেন।

গ্রীষ্মকালে জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় পণ্ডিত গদাধরের আবির্ভাব এবং একমাস পরে আষাঢ়ী অমাবস্যায় তিরোভাব-তিথি। পণ্ডিত গোস্বামীর চরিত্র নিজ প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে একটী নীরব পূর্ণ-আত্মোৎসর্গময় উপঢৌকন বিশেষ। লক্ষ্মীদেবীর স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দর্শনে যাঁহারা বিরোধালঙ্কারের চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গমে যে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদনে সমর্থ, তাঁহারাই শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামীর অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের অসাধারণ মহিমা অনুভবের অধিকারী। তিনি শিশুকাল হইতেই অতি সরল, নিরীহ, অনাড়ম্বর ও সৌজন্যপূর্ণ, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ এবং বন্ধুজনে প্রীতিবান্। তিনি সুশীল হইয়াও সশঙ্ক, নিবেদিতাত্ম হইয়াও অপরাধীবৎ, পূর্ণপ্রজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞ-বৎ, অধিনায়ক হইয়াও অনুগত ভৃত্যবৎ। নিজ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁর নিষ্ঠা—গৌরসুন্দরের সাধারণ অনুচরগণের কটাক্ষেও তাঁহাকে সঙ্কুচিত ও সশঙ্ক করায়। তাঁর শ্রীগুরুগৌরে উন্মাদনাময় তন্ময়তা তাঁর অর্চ্চনমন্ত্রের বিস্মরণ ঘটায়। শ্রীগৌরাঙ্গে স্বল্পশ্রদ্ধাও তাঁর হৃদয় এতদুর আকর্ষণ করে যে তাঁর প্রতিস্নেহপ্রকাশে তিরস্কার পুরস্কার ভূষণ করিয়া লন। শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর চরিত্র এককথায়—নিজ সর্ব্বস্ম্পদ দান করিয়া স্বেচ্ছায় ভিক্ষুকবেশ পরিগ্রহের অবহেলিত মূর্ত্তবিগ্রহ।

শ্রীগদাধরের সম্পদ—তাহা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য বা শিবি দধিচীর দেহ-বিসর্জ্জনবৎ বাহ্য-সম্পদ নহে। তাহা ধাত্রীপান্নার প্রাণাধিক পুত্র বা পদ্মিনী প্রভৃতির সতীদেহোৎসর্গ মাত্র নহে। এমন কি তাহা সক্রেটিশের আত্মানুভূতি বিতরণের নিমিত্ত বা যীশুখৃষ্টের জগদুদ্ধারের জন্য দেহোৎসর্গ মাত্রও নহে॥ উচ্চস্তরে অবস্থিত আত্মবিৎগণের দেহত্যাগ অতি সামান্য কথা। আভ্যন্তরীণ দেহগত বা স্বরূপগত সম্পদ পরিত্যাগ অধিকতর দুঃসাধ্য। যদি মুক্তাত্মার ভক্তিসম্পদের তথা তদূর্দ্ধে প্রেমাস্পদের স্বরূপ আমরা হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হই, তবেই শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর অসমোর্দ্ধ হৃদয়সম্পদ দানের হৃদয়বত্তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিব এবং উহা বোধগম্য হওয়া একমাত্র তাঁহার বা তাঁহার নিজজনের অনুকম্পার দ্বারাই সম্ভব। এইসব দুরূহ বিষয় সহসা সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি আবশ্যকবোধে দিদ্গর্শন করা হইতেছে।

পুনশ্চ দেয় পদার্থের তারতম্য বিচারে যেরূপ মর্য্যাদা নির্ণয় কর্ত্তব্য, তদ্রূপ আবার দানের পাত্রের যোগ্যতার তারতম্যে দানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় অবশ্য বোদ্ধব্য। যত উচ্চাধিকারী ব্যক্তি দানের গ্রাহক হইবেন, দাতার দানের মহিমা ও ফল তত উচ্চ হইবে। সে বিচারে শ্রীপণ্ডিত

গোস্বামীর আত্মদানের বস্তুগত ও পাত্রগত শ্রেষ্ঠতার কোন তুলনা নাই। যেহেতু শ্রীরাধাপ্রেম-সম্পদ সর্ব্বোত্তম বস্তু এবং দ্বিজসুত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানপাত্র। এই কথা আলোচনা করিতে আমাদের শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যান স্মরণ হইতেছে। পর পর উচ্চতর আত্মজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া চরম কথার অবতারণার পরেও জিজ্ঞাসুর আরও অধিকতর উচ্চ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কৌতূহল চরিতার্থতার সীমা গুরুতর ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

আমরা শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেও মহাজনগণ তাঁহাদের দিব্য-জ্ঞানলব্ধ গদাধরের পরিচয় আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া অশ্রদ্ধধানের অপরাধে আত্মনিমজ্জন ঘটাই। আবার কেহ কেহ শ্রীরাধাস্বরূপ-সম্পদ নিত্যানন্দ-বলদেবের স্কন্ধে কেহ বা দাস গদাধারের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেদের মনোধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া সম্বন্ধতত্ত্বে অপরাধী হই এবং নিজেদের স্বরূপসিদ্ধির দ্বার অর্গলবদ্ধ করি। কেহ বা গদাধরের গৌরকৃষ্ণোপাসনা পদ্ধতি বুঝিতে অক্ষম হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াপতি গৌরনারায়ণে ভোগবুদ্ধিবশে সম্ভোগ আহ্বানে নারায়ণকে নাগর সাজাইয়া বসি। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবযুক্ত হইলেই শ্রীগৌর, এবং গৌর রাধামুক্ত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মধুরাদি সর্ব্বরসের উপাস্য। শ্রীরামাদি ভগবত্তত্ত্ব সেই প্রকার নহেন। দ্বিজসুত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বা ন্যাশ্বীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কখনও নাগরভাব অবলম্বনে পরস্ত্রী সম্ভাষণাদি করেন নাই বা করেন না। সে আদর্শে পারকীয় সম্ভোগদর্শন রসাভাস—অপরাধ—মহাজনবিরোধী—পাষণ্ড মতবাদমাত্র। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক মহাজন গ্রন্থে এইপ্রকার গৌর-নাগর-বাদের কোন ঘটনা বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ আদৌ নাই বা থাকিতে পারে না। নিজ পতি দেবোপাসনায় রত থাকাকালে পতিব্রতা পত্নী যেমন উপাসনারত পতির উপাসনা চেষ্টার আনুকুল্য করিয়া পতিসেবা করেন, পরন্তু সেকালে দাম্পত্যুচিত রসালাপ দ্বারা পতির দেবোপাসনার ব্যাঘাত করেন না, তদ্রূপ শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণসাধনাপর চিন্তাসক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থাৎ তদুচিত্ত স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণারাধনা লীলায় শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীগদাধর আরাধনাপর প্রভুর আরাধনা বিষয়ে আনুকূল্যময় জীবন প্রকাশ করেন ; অর্থাৎ এইরূপই গদাধরে নিত্য প্রকাশিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য ব্রজবিলাসময়, আর শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ নিত্য নবদ্বীপস্থিত ঔদার্য্যময় ; ব্রজমাধুর্য্যে যাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণ—নবদ্বীপ ঔদার্য্যে তাহাই শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গ। অন্য প্রকার ভাবনায় উভয়ের একত্ব বিঘাতক। সাধকগণের সাধারণ মতবাদ পরিত্যাগ ও মহাজন পথই আশ্রয়নীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-দেবতা হইয়াও সম্ভোগ-প্রধানহেতু সকল অধিকারে প্রেম-দেবরূপে প্রতিভাত হন না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বিপ্রলম্ভ বা ঔদার্য্য রসাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান্ বদ্ধজীবসাধারণের নিকটও প্রেম-দেবতা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই প্রেমদেবতাকে আপামরে দান করিতে ব্যাকুল ভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণরত শ্রীগুরুদেবতা-স্বরূপ। আর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পৃথিবীতে আবাহনকারী ও আনয়নকারী বর্ত্মপ্রদর্শক পরম মঙ্গলময় দেবতা। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি সেই প্রেমদেব শ্রীগৌরাঙ্গর সংকীর্ত্তন লীলার পীঠদেবতারূপে শ্রীগৌরলীলায় সহায় সম্পদ। শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীবাদি প্রেম প্রস্রবণের অমৃতময়ী ধারাসমূহ সর্ব্ববিশ্ব সঞ্জীবিত করিতেছে। (এ পামর দুরাশাবশে একবিন্দু অমৃতের লুব্ধ ভিক্ষুক ; শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাই একমাত্র ভরসা)।

প্রেমদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের জয়গান করিতেই এই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। প্রেম-ধনের সর্ব্বোত্তম আস্পদ নিজ প্রিয়তমার ভাব অঙ্গীকারেই উহা সম্ভব বুঝিয়া তাহা শ্রীরাধার নিকট হইতে আহরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে শ্রীরাধার আরাধনা করিবেন—করিলেনও তাই। কিন্তু ভক্ত-জনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাতেও তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অর্থাৎ গোপী-প্রীতি তথা শ্রীরাধা বশ্যতা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। গৌরের গদাধর প্রীতি অনন্যসাধারণ। কিন্তু এই প্রীতির রূপ পালটাইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ রাধার ভাব-সাজ পরিলেন—শ্রীরাধা রিক্তভাবে দাঁড়াইলেন, ইহাই শ্রীগদাধরমূর্ত্তি। গৌরের রাধাভাবে কৃষ্ণারাধনার অন্তরালে শ্রীগদাধরের

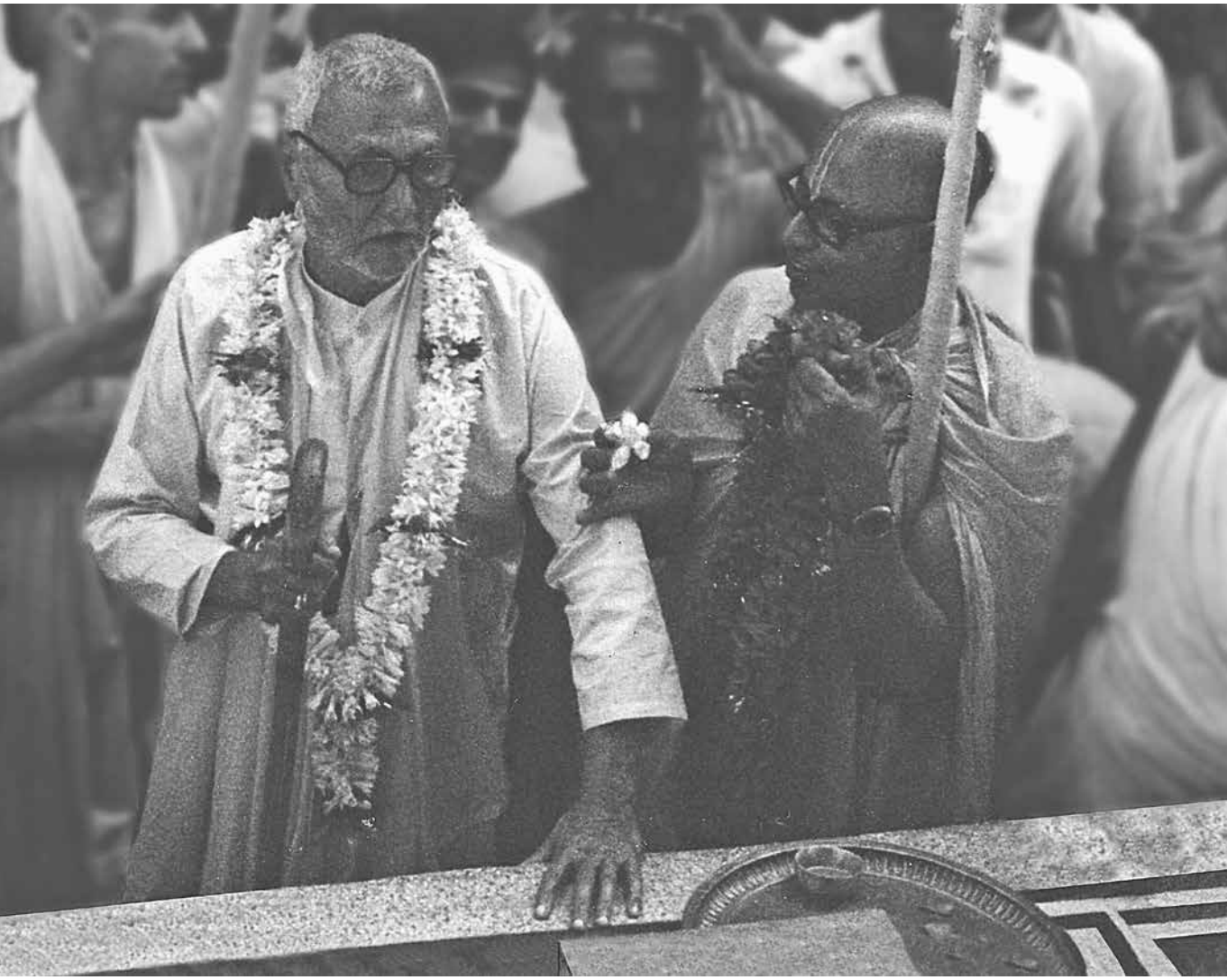

প্রিয়তমে সর্ব্বস্ব অর্পণের পর নগ্ন মহিমাময়মূর্ত্তি নিরীক্ষণে লুব্ধ নয়ন, অন্তরঙ্গ জনের সুতীক্ষ্ণ প্রেমলুব্ধ পিপাসু-দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইল। উপাস্য উপাসক সাজিলেন। উপাসক উপাসনার উপায়নের উৎস পর্য্যন্ত উপাসকরূপ উপাস্যের সমীপে অর্পণ করিয়া সর্ব্বাত্মার্পণের ধন্য মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন। তাহাতে উপাস্যের উপাসকের প্রতি যে আকর্ষণ বা প্রীতি, সেই অমূল্যধন লাভের আশায় গৌরজন গদাধরের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গভজনরূপ অপূর্ব্বভজন পন্থা ও ভজন ফলের আবিষ্কার করিলেন। শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরস অধিকতর উন্নতভাবে গদাধর জনের আস্বাদনের বিষয় হইল।

গদাই-গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাপতি জয় শ্রীবাসাদিভক্তগণ॥

আনুগত্যই ভজন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ

ভজন কি ? ভজনীয় তত্ত্বের সেবা। যদিও তথাকথিত সেব্যতত্ত্বের ধারণা বহুরূপে মানবহৃদয়ে স্থান পায়, তথাপি শুদ্ধ সত্ত্বাজ্জ্বল হৃদয়ে যে সেব্যমূর্ত্তির প্রকাশ তাহা ভগবৎতত্ত্ব। এই ভগবদ্বস্তুর মূল আকরবিগ্রহ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—তিনি 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ' ইহা পরমমুক্তকুল পরিগীত।

ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

বেদ, বেদান্ত, গীতোপনিষদাদির ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব ভজনীয় বস্তু একমাত্র সশক্তিমান্‌তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণভজন প্রকৃতাভিমানী জীব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বলিয়াছেনঃ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

এই শ্লোকেও জানিতে পারি যে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ-লীলা পরিকর-বৈশিষ্ট্য সমস্তই অপ্রাকৃততত্ত্ব। সেবা-পরায়ণ অধিকারী জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়াদিতে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হন মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর ও—অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর—বলিয়াছেন। প্রকৃত কৃষ্ণভজন-কারীও অপ্রাকৃত। আরও—দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥" বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবাপর ভক্ত কোন অপ্রাকৃত রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রাকৃত কলেবরে কৃষ্ণভজন করেন। কৃষ্ণভজন বিষয়ে জীবের জড়ানুভূতির অহঙ্কার কেবল আত্মবঞ্চনামাত্র।

এখণ প্রশ্ন হচ্ছে—'মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।' অতএব কিভাবে সেই সমস্ত জীবের উক্ত সৌভাগ্য লাভ সম্ভব ?

উত্তর—এই সমস্যার সমাধান কল্পেই সাধু-গুরু-শাস্ত্রের আবির্ভাব।

প্রশ্ন—কিন্তু জীব তাহা পাইবে কিভাবে ?

উত্তর—একমাত্র আনুগত্যের দ্বারা। হাঁ, আনুগত্যই একমাত্র কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির উপায়। অপ্রাকৃত ভজনশীল ভক্তের আনুগত্যের ফলেই কৃষ্ণভজন প্রবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইবে।

সাধু ও সাত্বতগণ জীবের কেবল-স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকারে ধীক্কার দান করিয়া তাহাদের ঈশপারতন্ত্র্যকেই একমাত্র উপেয় বলিয়া জানাইয়াছেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বর সম্পর্ক একমাত্র—সতাং প্রসঙ্গাদ্—সম্ভব। সাধু বৈষ্ণবগণের জীবনই আনুগত্যময়। তাঁহদের ইন্দ্রিয়চেষ্টা চব্বিশঘন্টাই কৃষ্ণভজনপর।

তুলসীদাস—

সন্ত বড়ে পরমার্থী, শীতল উন্‌কি অং।
তপন বুঝায়ত আউরকে ধরায়ত আপনা রং।

অতএব যিনি যতশীঘ্র আত্ম ধর্ম্মে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুর মনকে নিজের মন করিয়া লইতে পারিবেন, সাধুর কৃত্যকে নিজের কৃত্য করিয়া লইতে পারিবেন, তিনি ততশীঘ্র পূর্ণকাম হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত সেবকগণকর্ত্তৃক অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারাই সেবিত হন। আর প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তিও অব্যভিচারী হইতে পারে না। অতএব "লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।" একথা ধ্রুবসত্য। আমাদের অভীষ্টপ্রদ আচার্য্যদ্বয়ের স্তবে দেখিতে পাই যে—

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ।
তত্ত্বং তত্ত্ববিদূত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়ান্ চক্রতু॥

অতএব এবিষয়ে অনবহিত থাকা বা নিশ্চেষ্ট থাকাই একমাত্র জীবের দুর্ভাগ্য। কিমধিকমিতি।

শ্রীজগন্নাথ রথ

যাত্রা

এই বছরে শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ প্রায় চারশ স্বদেশী বিদেশী ভক্তকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ যাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিনে এক সপ্তমা ধরিয়া তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যদেবের মন্দিরে হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে হাঁটিয়া হঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রস্থ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদের রথযাত্রা দিনে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা আর শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে অসঙ্খ্যা ভক্তজনের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দ পরমোৎসাহে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার উপলক্ষে
শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমা ২০১৩
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্যা
প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
সেবায়েত আচার্য্য শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনিশ্চল আচার্য্য মহারাজ

পানিহাটি মহোৎসব

আবার এই বছরে শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থিত শ্রীপানিহাটি গ্রামে যাইয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। সারা দিন শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পাঠকীর্ত্তন করিয়া অসীম ভক্ত ও ভাগ্যবান লোকজনকে চিড়া-দই প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। এখনও প্রায় পাঁচশ বছর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরে পানিহাটি লীলার পরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভক্তবৃন্দ আনন্দেতে "দয়াল নিতাই" নাম দিয়া প্রভুদ্বয়ের পরমকরুণাময় লীলা মাহাত্ম্য কথা বলিয়াছিলেন। এই বছরেও ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপার প্রভাব দেখিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়া উৎসাহিতভাবে এই চিড়া-দই মহোৎসব পালন করিয়াছিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাইবার উদ্দেশ্যে পানিহাটি আসিয়াছিলেন। তাৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। সেই সময় সর্ব্বসাধরণ ভক্তগণের শিক্ষাইবারে শ্রীমন মহাপ্রভুর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন।

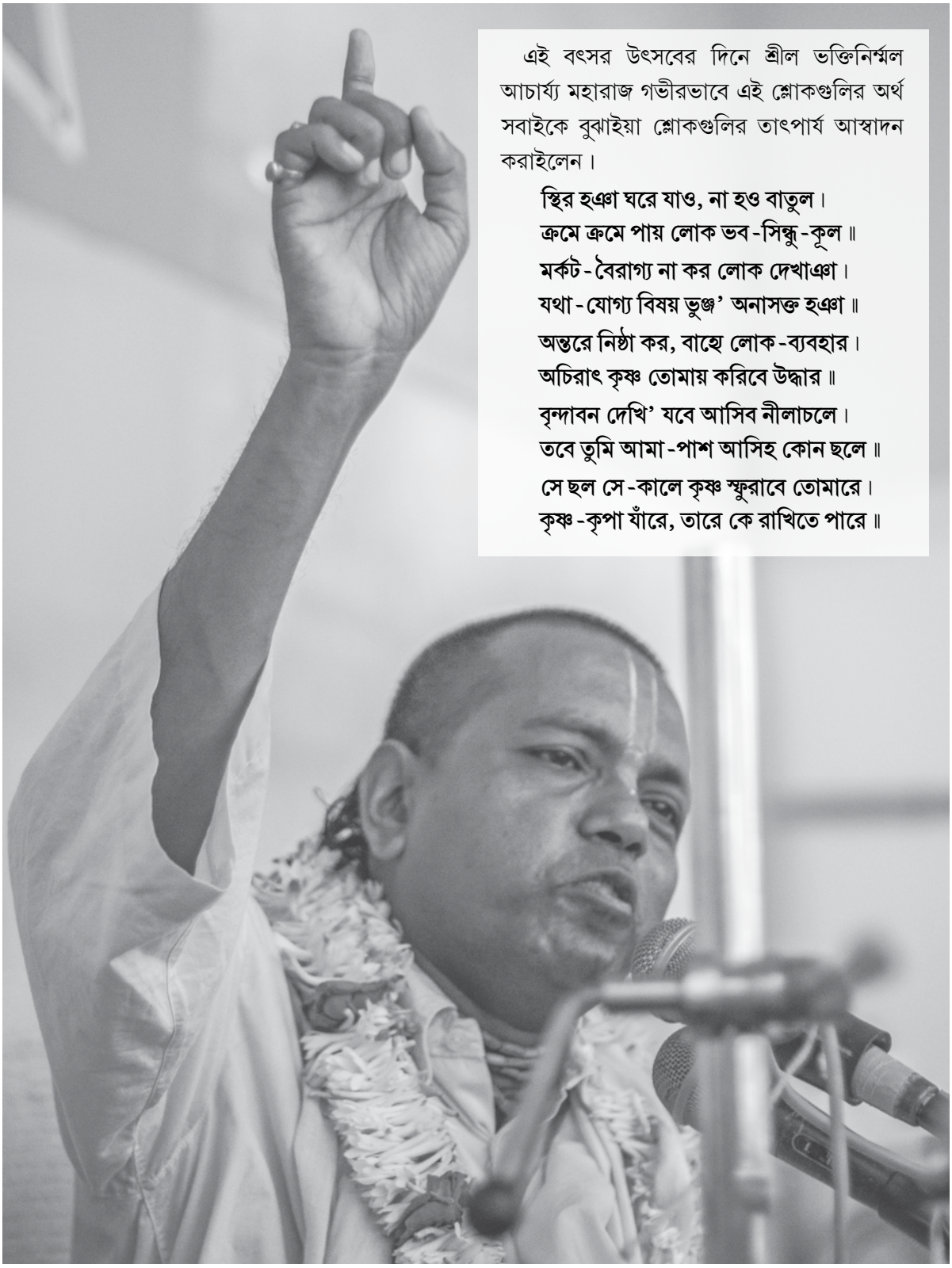

এই বৎসর উৎসবের দিনে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ গভীরভাবে এই শ্লোকগুলির অর্থ সবাইকে বুঝাইয়া শ্লোকগুলির তাৎপার্য আস্বাদন করাইলেন।

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথা-যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সে-কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ-কৃপা যাঁরে, তারে কে রাখিতে পারে॥

শিলিগুড়ি উৎসব

শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ পূর্ব্ব বৎসেরের ন্যায় এই বছরেও শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘের শিলিগুড়ি শাখায় স্থিত শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর-জীউর প্রাকত্য বার্ষিকী মহোৎসব আয়োজন ও পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীল আচার্য্যদেব এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥

'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥

যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গয়া গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি চক্রবেড় গিয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের মাহাত্ম্য কথা

শ্রীব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। সেই ঠিক সময় হইতে তিনি তাঁহার প্রেমভক্তি আস্বাদন ও বিতরণ লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৈবযোগে শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত জীবের পরমার্থিক জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্তে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের নিকটে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দীক্ষা গ্রহণকালে প্রার্থনারূপে উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, ভক্তের শরণাগতি না থাকিলে দীক্ষা পাওয়া, সংসার উদ্ধার হওয়া ও কৃষ্ণশুদ্ধভজনরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করা কখন যাইবে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় বলিয়াছিলেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ " অর্থাৎ যাহারা যে প্রকার আমাকে ভজনা করে থাকেন আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজন ফল দান করে থাকি। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে অর্থাৎ প্রকৃত দীক্ষা, সংসার উদ্ধার, শুদ্ধভক্তি ও দিব্য ভাগবৎ-প্রেম লাভ করিতে সুদৃঢ়বিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'শ্রদ্ধা' শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

সেই প্রকার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যিকারের সাধনভজন অনুশীলন করিতে আনুপ্রেরণা বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক দিন চার, পাঁচ, এমনকি ছয় ঘণ্টা ধরিয়া পাঠ করিতেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রচুর উৎসাহ সহিত দিনে দিনে শিলিগুড়ির সকল পল্লীবাসীর পরম মঙ্গলের নিমিত্তে শ্রীগৌরসুন্দর বিহিত কলিযুগধর্ম্মরূপ হরিনামসঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

উৎসবের প্রধান দিনে বহু ভক্ত ও ভাগ্যবান দর্শনার্থী আসিয়া শ্রীবিগ্রহগণের প্রসাদ পাইয়া নিজেদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুবর্গের স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং ভাগবৎ-প্রসাদ পরিবেশনের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষে সকলেই মনে করিলেন যে, মহোৎসবের পর এই বৎসরে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ শিলিগুড়ি শাখা সুন্দরভাবে চলিবে।

শ্রীচন্দন যাত্রা

শ্রীল গুরুদেবের, শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের, দীর্ঘকালীন ইচ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্তে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগুপ্তগোবর্দ্ধনস্থ শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জলক্রীড়া লীলা মন্দিরে একুশ দিন ব্যাপী শ্রীচন্দন যাত্রা মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ শ্রীগৌরসুন্দর চন্দন লেপনের সহিত শ্রীমন্দিরের বাহিরে যাইয়া ভক্তবৃন্দদের লইয়া নৌকায় উঠিয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। আনন্দেতে ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার পুরীর শ্রীচন্দন যাত্রা দর্শন লীলা স্মরণ করিতেন। সেইখানে প্রতি বৎসর রাম ও কৃষ্ণ অর্থাৎ জগন্নাথ ও বলদেব এবং তাঁহার বিজয়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি করিয়া থাকেন এবং শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় সেই জলকেলি যাত্রাকে দর্শন করিয়া থাকিতেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য লীলা, ৮।১০২–১১১) লিখিয়েছেন—

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥

হরিধ্বনি কোলাহল মৃদঙ্গ-কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজায়ে বিশাল ॥

সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥

মহা-জয়-জয়-শব্দ, মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে ॥

জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা-সঙ্কীর্ত্তনে ॥

দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥

চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল ধরিয়া শ্রীগুপ্তবৃন্দানরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবস্থান করিয়া আছেন। তবুও তাঁহার প্রপঞ্চ লীলায় যখন তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামের পরিদর্শন করিয়াছিলেন তখন তিনি অসীম সেবারূপ আনন্দ পাইয়াছিলেন। এই বৎসরে যখন আমাদিগের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল পরম গুরু মহারাজের সমাধি স্থান মন্দির হইতে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের মধ্যস্থ শ্রীমন্দিরের শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীবিগ্রহের নিকটে গিয়াছিলেন তখন ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবন দর্শন লীলা স্মরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যে-লীলা, ১৭।২২৬–২২৮) বর্ণনা করিয়াছেন—

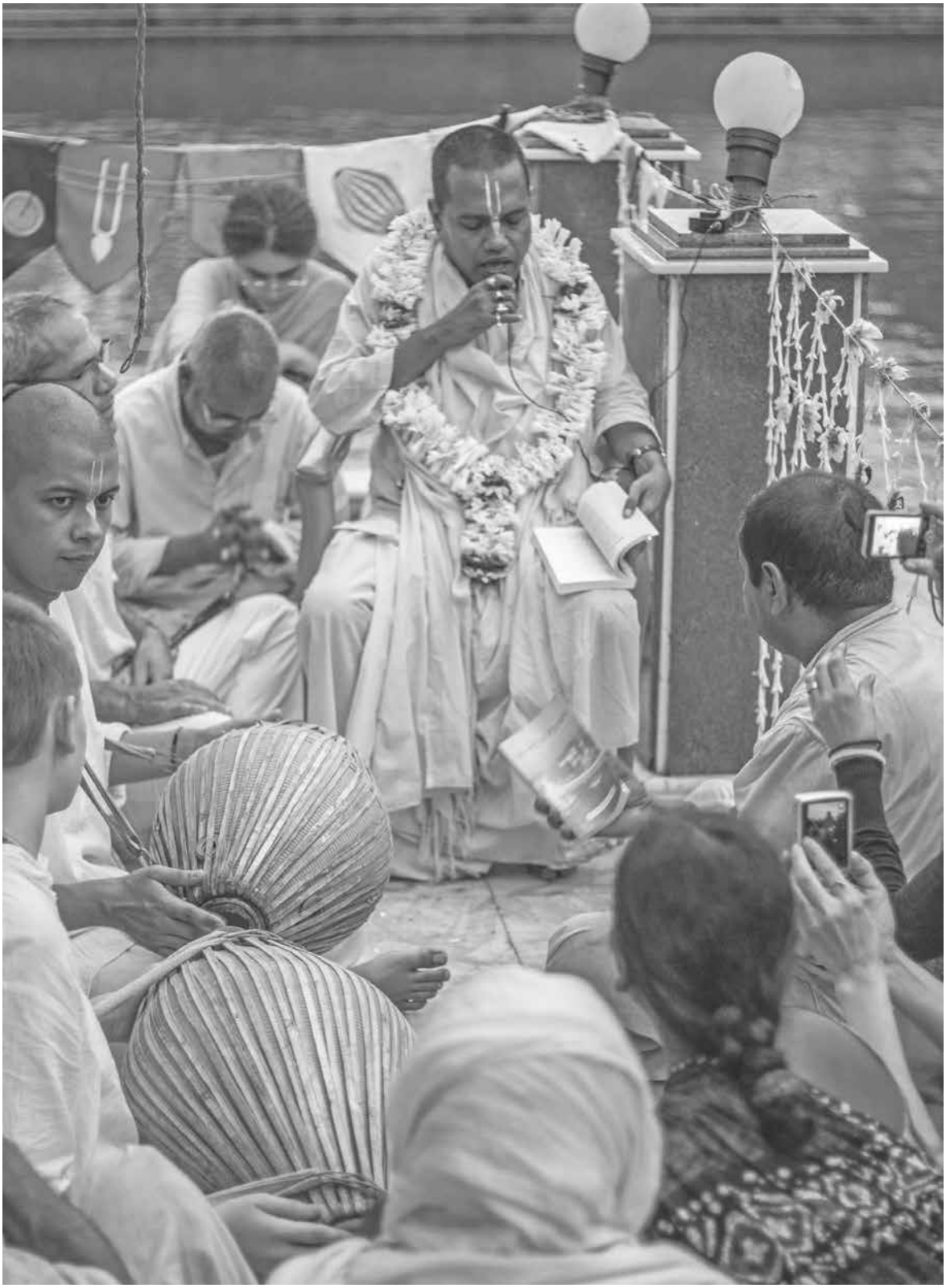

নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত-গুণ॥

সহস্র-গুণ প্রেম বাড়ে মথুরা দরশনে।
লক্ষ-গুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেন যবে বনে॥

অন্য-দেশ প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' -নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রমযে এবে সেই বৃন্দাবনে॥

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের নিকটে সকলের সন্তোষের উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃত ভাগবৎ কথা সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

হুগলীতে প্রচার

ইহা বৎসরের বৈশাখ মাসে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ সুকৃতিবান্ মানুষ্যকে শুদ্ধভক্তির পথে লইয়া আসিতে বহু জেলা ও গ্রামে যাইয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন পরিচালনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সমগ্র উপস্থিত দর্শনার্থীরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বিশুদ্ধ সারস্বত গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সুস্পষ্ট সরল হৃদয়-স্পর্শী হরিকথা বলিতে বলিতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রবণকারী সজ্জনগণকে শুদ্ধভক্তগণের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হৃদয়াঙ্গম করাইয়াছিলেন। এইরূপ পরমমঙ্গলকারী উপকার পাইয়া প্রচুর গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ সহৃদয় দিয়া উচ্চৈস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করিতেন এবং দৈনিক নিষ্ঠাবান্ সাধনভক্তি অনুশীলন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বিরহ মহোৎসব

স্বদেশী ও বিদেশী ভক্তবৃন্দ মিলিত হইয়া শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের আনুগত্যে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের তিরোভাব মহোৎসব পালন করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের বিরহে শ্রীল আচার্য্যদেব আচার ও প্রচার করিয়া শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিবার নিমিত্তে আমাদিগকে অনুক্ষণরত নব-নূতন ভাবে আনুপ্রাণিত করিতেছেন।

শ্রীল গুরুদেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইয়াছিল যে, সকলেই নিজদিগের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মন্দির স্থাপন করিয়া সাধুসাঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া শুদ্ধভাবে নিষ্কাম ভজন করিয়া থাকিবেন। সেই অন্তর্গত আদর্শ অনুসারে সকলেই বাহিরগতে শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামভজন উপদেশ মেনে চলিবেন—সেই বাক্য তিনি নিত্যদিবসে ভক্তগণাদিকে হৃদয়াঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিতেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীল গুরুদেবও বলিয়াছিলেন যে, যদি আমি ইহা জগৎ বাসীবৃন্দদিগের শুধু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতাম,

তাহা হইলে আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" বলিতাম। আরও তিনি সর্ব্বক্ষণ বলিতেন,— "বিনয়ী হন, সহ্য হন, নিরাভিমানে সকলকে সম্মান করুন। সেইটী করিতে পারিলে সর্ব্ব প্রকার অপরাধ ও ভজনের বিঘ্ন নাশ হইবে এবং শ্রীনামপ্রভু স্বয়ং আপনাদিগের হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া কৃপা করিয়া সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকিবেন।"

আমরা ইহা জগতের আমাদিগের নিজদিগের কর্ম্মদোষে ও মায়ার প্রভাবে ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লেশ পাইতেছি। তবুও শত দুঃখ শত গঞ্জনা শত লাঞ্চনা পাইলেও আমরা কখনও হরিভজন সাধন পরিত্যাগ বা ইহার মধ্যে মধ্যে শৈথিলতা প্রকাশ করিব না সেই প্রতিজ্ঞা আমরা আমাদিগের দীক্ষার দিবসে শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত যন্ত্রনা পাইয়া হরিভজন ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি কাজী ও বহু বিরোধি জনের নিকটে উচ্চৈস্বরে বলিয়াছিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

এইরূপ আদর্শ অনুসারে আমরা ভাবিব যে, যখন আমি শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া কিছু ক্লেশ পাইতেছি তখন আমি শরণাগতভাবে শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে বিশেষ সুযোগও পাইতেছি এবং সেই প্রকার সুযোগ একমাত্র শ্রীল গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় সম্ভব, তদ্ব্যতীত সম্ভব হইত না।

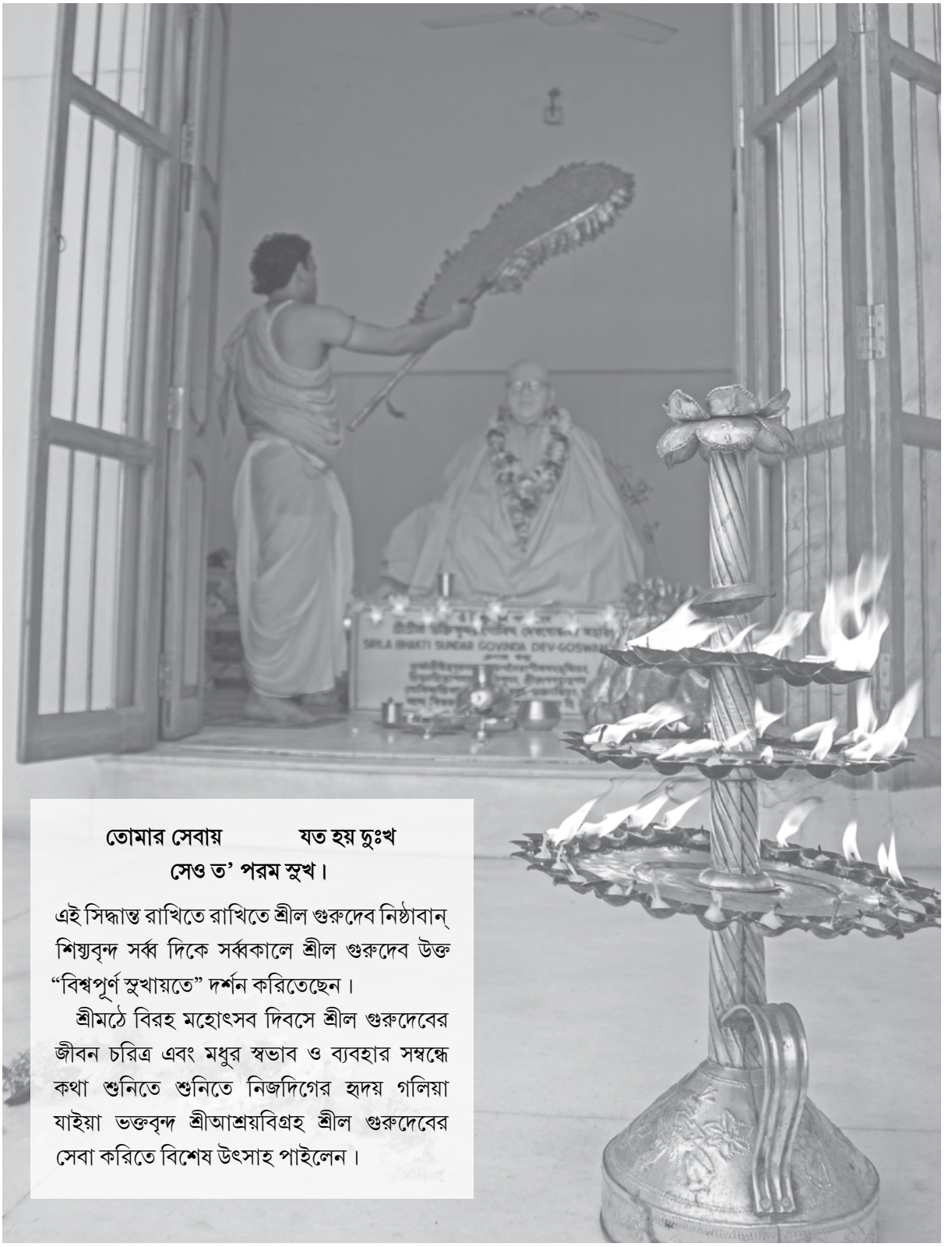

তোমার সেবায় যত হয় দুঃখ
সেও ত' পরম সুখ।

এই সিদ্ধান্ত রাখিতে রাখিতে শ্রীল গুরুদেব নিষ্ঠাবান্ শিষ্যবৃন্দ সর্ব্ব দিকে সর্ব্বকালে শ্রীল গুরুদেব উক্ত "বিশ্বপূর্ণ সুখায়তে" দর্শন করিতেছেন।

শ্রীমঠে বিরহ মহোৎসব দিবসে শ্রীল গুরুদেবের জীবন চরিত্র এবং মধুর স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে কথা শুনিতে শুনিতে নিজদিগের হৃদয় গলিয়া যাইয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ শ্রীল গুরুদেবের সেবা করিতে বিশেষ উৎসাহ পাইলেন।

চাতুর্ম্মাস্য

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যে ও নানা-স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিতে আছে,—

আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥

অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥

আষাঢ়-মাসে শুক্লা দ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসকাল এই ব্রতের সময় অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস-কাল উপরিলিখিত তিনপ্রকার বিচার-অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক-মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। ঊর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

ইত্যাশ্বাস্য্য প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চাতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণ ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নায়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

ব্রতের গ্রহণীয়-বিধিতে ভগবানের নিয়মসেবা ও জপ-সংকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা,—

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মনারদ সংবাদেঃ—

জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

"চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে।"

কালোচিত ফল-মূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন-পূর্ব্বক সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম; রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুণ এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুণ বা সাহের-বেগুণ অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুণ প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ-দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতায় সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

হরিভজন-পরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস—তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, তপ, ধ্যান—প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলনও করিতে প্রবৃত্ত হন, তবেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতেছেন না, পরন্তু নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতেছেন মাত্র।

'নিজেন্দ্রিয় প্রীতি' হরিভজনের কপটসজ্জায় প্রকাশিত হইয়া উপভোগের ছলনায় অনেক সময় লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা কনক, কামিনী সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় 'হরিভজন' নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবানুগত্য। গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার" ন্যায় কুচেষ্টা। বদ্ধাবস্থায় ত' গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশ লাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতে যে সিদ্ধদেহে হরিভজন-প্রণালী তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধমাত্র সার হয়।

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর